৯৮
৯৭০
৭২

কর্ম্মদেবী

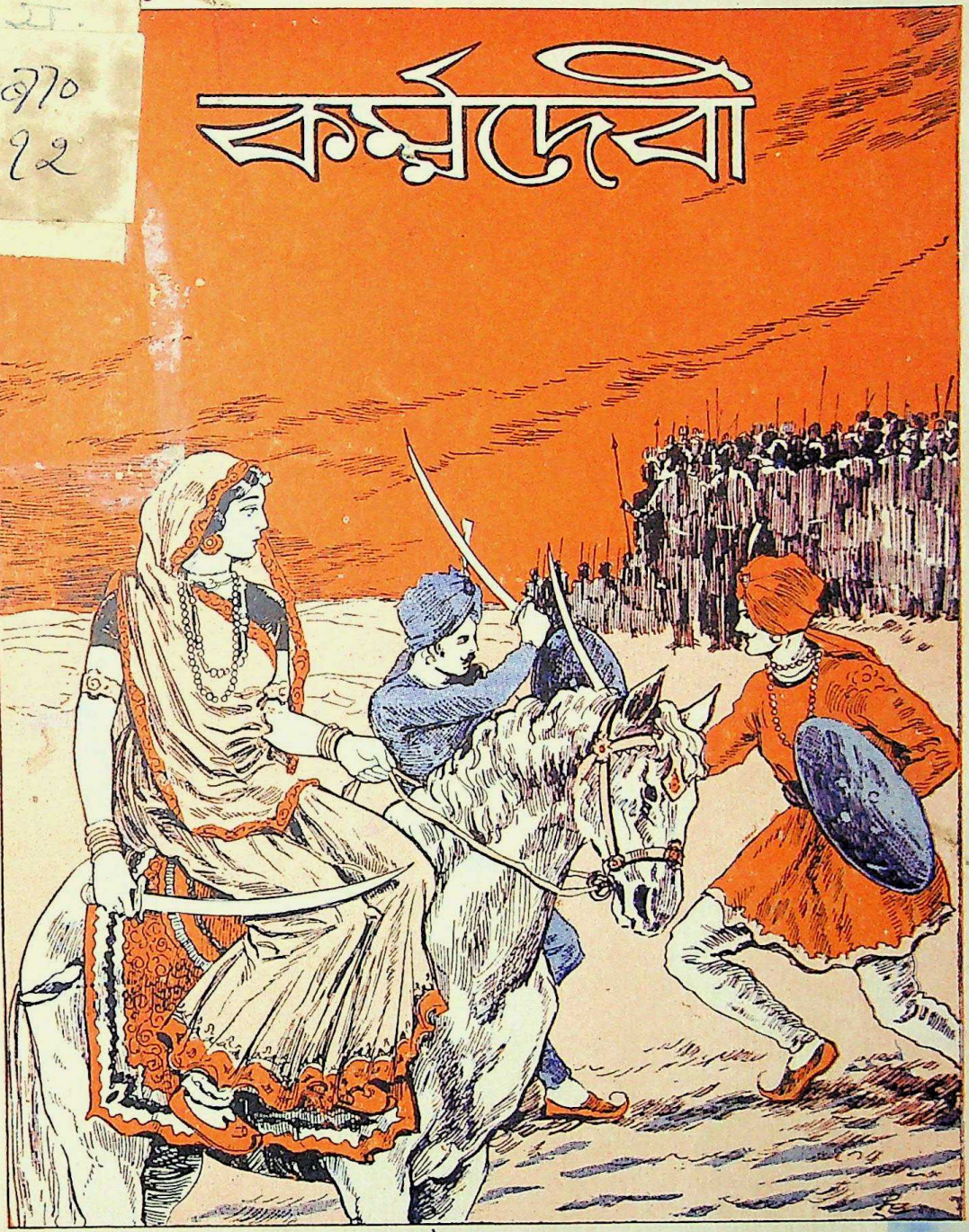

কর্মদেবী

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকর্ত্তা কর্ত্তৃক তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর প্রাইজ, লাইব্রেরী ও অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তকরূপে লিখিত।

আর্য্যলক্ষ্মী সিরিজ—১০নং গ্রন্থ

কর্ম্মদেবী

পদ্মিনী, কৃষ্ণকুমারী, মীরাবাঈ, রাণী ভবানী, রাজ্যশ্রী,
গার্গী প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িত্রী

শ্রীপ্রীতিকণা দত্তজায়া
প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
আশ্বিন
১৩৬২
২

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
ছয় আনা

মাণিকরায় যখন কর্ম্মদেবীর গুণের কথা সাধুর কাছে বলছিলেন, তখন লজ্জায় তার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠছিল। —১২ পৃষ্ঠা

কর্ম্মদেবী

এক

—আজ একটা বড় সু-সংবাদ আছে সখী।

—কি সংবাদ ভাই?

—আগে সন্দেশ খাওয়াবে বল, তারপর বলব।

—বাবা, আজ আমায় নিয়ে শিকারে যাবেন, এই ত?

—শিকারে আজ কি নতুন যাচ্ছ নাকি?

—তবে কি শুনি?

—আগে সন্দেশ খাওয়াবে বল—

—যা'ক গে, একটা নুতন গান শিখেছি শোন্—

—খবরটা আগে বলি,···প্রাণমন শীতল হবে, গানটাও জম্‌বে ভাল।

—তোর হেঁয়ালী রাখ্ কমলা, কি খবরটা নিয়ে এসেছিস্ বল।—ওঃ, বুঝেছি, তোর বিয়ে বুঝি?

—আমার কেন হতে যাবে, যে বল্‌ছে তার'ই।

—ইস্!

—হ্যাঁ গো রাজকুমারী, সত্যি।···এই শাঁখ আর শানাই বেজে উঠ্‌ল বলে। আজ রাঠোর রাজের দূত আর পুরোহিত এসেছিলেন। আমাদের মহারাজ একরকম কথা দিয়েই ফেলেছেন, এর পর একদিন পাকা দেখা হবে।

কর্ম্মদেবী হেসে বল্লেন,—তাহ'লে সেই বুড়ো রাঠোর রাজার সঙ্গেই আমার বিয়ে,···বিয়েতে খুব ঘটা হবে, না ?

—না গো, না।···রাজকুমার অরণ্যকমলের সঙ্গে বিয়ে।—ঘটা হবে বই কি ?···ঔরন্তী রাজ্যের রাজকুমারীর বিয়ে, ঘটা হবে না ?

—তা' হ'লে তোর সন্দেশ খাবার ব্যবস্থা ত' হয়েই রয়েছে, আমার কাছে আবার চাইছিস্ কেন ?

—আচ্ছা বেশ, ঘাট্ হয়েছে আমার, এখন একটা গান গাও দেখি,···

কর্ম্মদেবী বীণা বাজিয়ে গান গাইলেন। কিন্তু গানে না হ'লো সুর, না হ'লো তান,—না হ'লো লয়।···অন্য দিন গান যেমন জমে, আজ আর তেমন জমলো না।

কমলা ঠাট্টা ক'রে বল্লে—মনের আনন্দে গানটার গলা টিপে মারলে একেবারে !

কর্ম্মদেবী উদাস চোখে বাইরের ফুলে ঢাকা অশোক গাছটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কমলার হাত দু'খানি ধ'রে ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন,—ঠাট্টা রাখ্ ভাই, সত্যি কি আমার বিয়ে ?

—হ্যাঁ ভাই, সত্যি।

—মা, বাবা দু'জনেই রাজি হ'য়েছেন, তুই ঠিক জানিস্ ?

—এমন ভাল সম্বন্ধ, এতে রাজি হবেন না ?

—তা' ঠিক, অত বড় রাজ্যের রাজার ছেলে।—তা গুণ থাকুক আর না-ই থাকুক—

এ সময়ে রাজা মাণিকরায় এসে মেয়েকে ডাকলেন—চল মা

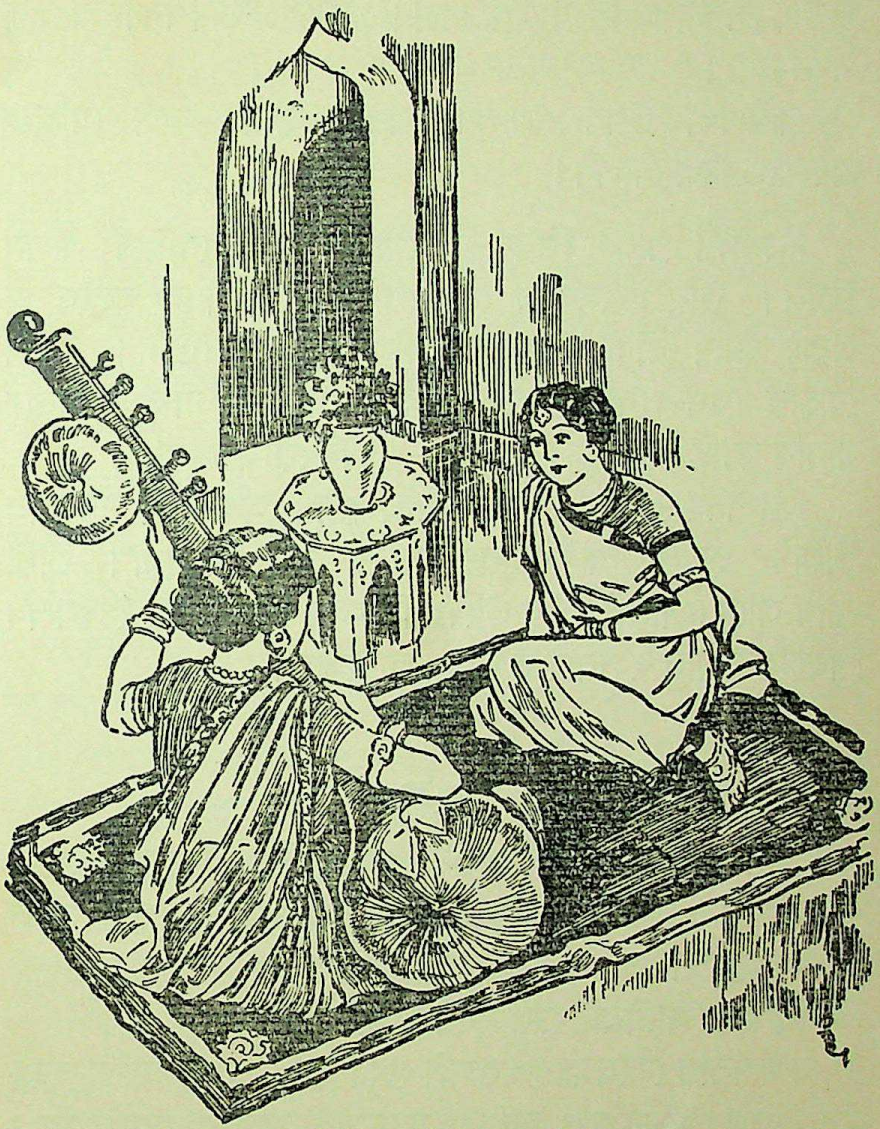

কর্ম্মদেবী বীণা বাজিয়ে গান গাইলেন।

করুন, শিকারের বেলা হ'য়ে গেল।···তাড়াতাড়ি শিকারের সাজ প'রে নাও।

কর্ম্মদেবী তখন—"এক্ষুণি আসছি বাবা" বলে পোষাক বদলাতে চলে গেলেন!

কিছুক্ষণ পরেই শিকারের পোষাক পরে বেরিয়ে এলেন তিনি। তাঁর তখনকার সেই পোষাক দেখলে কে বলবে যে একটু আগে বীণা হাতে নিয়ে গান গাইছিলেন তিনি। কঠিন যোদ্ধার বেশ—কোমরে তলোয়ার আর হাতে দীর্ঘ বর্শা নিয়ে বাবার কাছে এসে তিনি বললেন—আমি তৈরি বাবা।

এর পরই বেরিয়ে পড়লেন পিতা-পুত্রী। অশ্বারোহণে চললেন তাঁরা। দুজনেই দক্ষ সওয়ার—দুজনেই ওস্তাদ শিকারী। তাঁরা আগে আগে চললেন, আর তাঁদের পিছনে পিছনে চলেছে সৈন্যদল। শিকারের আনন্দে সবাই তখন মেতে উঠেছে।

দুই

রাজা মাণিকরায় রাজপুতানার যশল্মীর রাজ্যের একজন সামন্ত রাজা।···রাজ্য ছোট, রাজাও ছোট।···ঔরন্তী নগরে তিনি রাজত্ব করতেন।

এই রাজা মাণিকরায়ের কন্যা কর্ম্মদেবী।

কর্ম্মদেবীর যেমন রূপ, তেমনি গুণ। তাঁর ভুবন-আলো-করা রূপ, চাঁদের জ্যোৎস্নাও বুঝি তাঁর রূপের কাছে হার মেনে যায়।

তিনি যখন বীণা বাজিয়ে গান ধরেন, তখন গাছের ডালে কোকিলও বুঝি নীরবে ব'সে মুগ্ধ হ'য়ে শোনে সে গান। লেখা-পড়াও তিনি যথেষ্ট শিখেছেন। কিন্তু শুধু গান আর লেখাপড়া নিয়েই যে তাঁর দিন কাটে তাই নয়। তিনি রাজপুত রাজার মেয়ে, কি ক'রে যুদ্ধ করতে হয়, পিতা তাঁকে তাও শিখিয়েছেন। বনে পাহাড়ে শিকার করবার সময়ে কর্ম্মদেবী মাণিকরায়ের নিত্যসঙ্গিনী। কর্ম্মদেবী পিতার সঙ্গে শিকারে যান, তাঁর হাতের তীর বর্শার ঘায়ে বনের হরিণ, শূকর, এমন কি বুনো মোষ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ পায় না।

কর্ম্মদেবীর বড় সাধ, তিনি একজন বীর পুরুষের স্ত্রী হন,—না-ই বা থা'ক তাঁর বড় রাজ্য—না-ই বা থা'ক অফুরন্ত ধন-দৌলত!···

তাই সখী কমলার মুখে যেদিন শুনলেন, রাঠোর রাজকুমার অরণ্যকমলের সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্ত্তা পিতা প্রায় একরকম ঠিক ক'রে ফেলেছেন, সে দিন থেকেই তাঁর প্রাণের সমস্ত আনন্দ আহ্লাদ যেন নিবে গেল। সখীদের সঙ্গে হাসি তামাসা আর তাঁর ভাল লাগে না,—গানে মন বসে না,—শিকারে গিয়ে তাঁর ঘোড়ার সুমুখ দিয়ে হরিণগুলো নিরাপদে চ'লে যায়।·· সব কাজেই কর্ম্মদেবীর যেন উদাস উদাস ভাব।

সখীরা ভেবে পায় না, রাজকুমারীর এ ভাবান্তরের কারণ কি?

অরণ্যকমল একজন বড় রাজার পুত্র। সেখানে বিয়ে হ'লে

ভবিষ্যতে কর্ম্মদেবী অত বড় রাজ্যের রাণী হবেন।…অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁর পায়ের তলায় লুটোপুটি খাবে। তবে তাঁর মনে সুখ নেই কেন? সখীরা বুঝেই উঠতে পারে না। রাজকুমারীর এই ভাবান্তরের কারণ। তবে কি তাদের সখীর ইচ্ছে নয় রাঠোর রাজকুমারকে বিয়ে করা!

সত্যিই রাজকুমারীর ইচ্ছে নয় রাঠোর রাজকুমারের গলায় বরমাল্য দেওয়া। কি গুণ আছে অরণ্যকমলের? ক'টা যুদ্ধে তিনি জয়ী হ'য়েছেন? তাঁর বীরত্বের কোনো কথাই ত রাজপুতানার কেউ কখনো শোনেনি! কর্ম্মদেবী যে শৈশবকাল থেকেই মনে মনে কল্পনা ক'রে এসেছেন,—এমন একজন বীর পুরুষের তিনি স্ত্রী হবেন, রাজপুতানা জুড়ে যার বীরত্বের কথা সকলেই জানে।

এই কারণেই কর্ম্মদেবীর মনে নেই শান্তি। সব সময়েই তিনি কেবল ভাবেন, কি করে এ বিয়ে বন্ধ করা যায়! কুলদেবতার চরণে তাঁর প্রাণের ব্যথা জানিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বলেন,—ঠাকুর, বাবার আমার সুমতি দাও।

তিন

সে সময় রাজপুতানায় পুগল রাজ্যে সাধু নামে এক বীর রাজা রাজত্ব করতেন।

পুগল রাজ্য ঔরঙ্গী রাজ্য থেকে বড় বেশী দূরে নয়।

সাধু ছোট ছোট অনেক যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে তাঁর রাজ্য বেশ

বাড়িয়ে তুলেছিলেন। ভীলদের সঙ্গে তাঁকে প্রায়ই লড়াই করতে হ'তো। আর সে যুদ্ধে জয় হ'তো বেশীর ভাগ সাধুরই। তাই সাধুর বীরত্বের খ্যাতি আশ-পাশে বহুদূরে ছড়িয়ে প'ড়েছিল। রাজপুতানায় সে সময় বীরদের কথা বলতে সাধুর নামও আলোচিত হ'তো।

সাধু একদিন একটা বড় রকমের যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে ঔরঙ্গী নগরের পাশ দিয়ে তাঁর রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছিলেন। রাজা মাণিকরায় খবর পেয়ে বীর সাধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

রাজার বাড়ীতে রাজা অতিথি, অভ্যর্থনা-আয়োজনের পারিপাট্য বিশেষ রকমেই হ'লো।

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে বিশ্রামের সময় নানা রকম গল্প-সল্প আরম্ভ হ'লো। বীর তাঁরা, তাই বীরত্বের গল্পই হ'তে লাগলো বেশী।

শিকার, যুদ্ধ, ইত্যাদি…

পাশের ঘরে ব'সে কর্ম্মদেবী সে-সব বীরত্বের গল্প শুন্‌ছিলেন। গল্প শোন্‌বার তাঁর এত লোভ হ'লো যে, তিনি আর সেখানে ব'সে থাকতে পারলেন না। ধীরে ধীরে এসে বাবার পাশে বসলেন।

রাজা মাণিকরায় সাধুকে বল্লেন,—এটি আমার মেয়ে কর্ম্মদেবী।…আমার সাধ্যমত আমি একে রাজপুত মেয়ের মতই গড়ে তুলেছি। শিকারে করম আমার নিত্য সঙ্গিনী। এ সঙ্গে না থাকলে সে দিন শিকার যেন আমার ভাল লাগে না। বেশ

একজন পাকা ওস্তাদ শিকারীর মত করম শিকার করতে শিখেছে।

সাধু কর্ম্মদেবীর নাম ও রূপ-গুণের কথা আগে থেকেই শুনেছিলেন, এবার স্বচক্ষে তাঁকে দেখে ভারী খুসি হ'লেন।

মাণিকরায় যখন কর্ম্মদেবীর গুণের কথা সাধুর কাছে বলছিলেন, তখন লজ্জায় বালিকার মুখখানা যেন পাকা ডালিমের মত আরক্ত হ'য়ে উঠছিল। সাধুর চোখে বীর বালিকার সে সময়কার লজ্জারাঙা রূপটি ভারী সুন্দর ব'লে মনে হ'লো।

সাধু ও মাণিকরায়ের বীরত্বের গল্প চলতে লাগলো। কর্ম্মদেবী শ্বেত-পাথরের সুন্দর মূর্ত্তির মত বসে সে সব কথা শুনতে লাগলেন।

মাণিকরায় বল্লেন,—ভীল সর্দ্দার ভজুয়ার সঙ্গে আপনার আশ্চর্য্য যুদ্ধের কথা আমি সেদিন চারণের মুখে শুনলুম!···সে সব কথা যেন আমার স্বপ্ন ব'লে মনে হ'তে লাগলো।

কর্ম্মদেবী ধীরে ধীরে বল্লেন,—বাবা, ওঁর নিজের মুখে লড়ায়ের কথা শুনতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে।

সাধু তাঁর বীরত্বের কথা শোনবার এমন শ্রোতা আর আগে কখনো পাননি। তাই তিনি আগ্রহের সঙ্গেই তাঁর লড়ায়ের গল্প বলতে আরম্ভ করলেন।

কর্ম্মদেবী ভাটদের মুখে আরও অনেকবার সাধুর বীরত্ব-কাহিনী শুনেছেন। কিন্তু আজ সাধুর নিজের মুখে যেমনটি শুনলেন, তেমনটি আর কখনো শোনেননি।

বীরের সুমুখে ব'সে তাঁর নিজের মুখে তাঁর বীরত্বের গল্প শুনে কর্ম্মদেবী মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন।

সাধুরও মনে হ'তে লাগলো, আজ তাঁর বীরত্ব সার্থক হ'লো।

দু'দিন বিশ্রাম ক'রে সাধু নিজের রাজ্যে চলে গেলেন।

সাধু চলে গেলেন বটে, কিন্তু রাজকুমারীর মনে তিনি এঁকে দিয়ে গেলেন একখানি সুন্দর ছবি—যে ছবি বীরত্বের, যে ছবি সুন্দর এক যুবা পুরুষের। রাজকুমারী ভুলতে পারলেন না সে ছবি। সাধুর সামনে বসে তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনা সেদিনের সেই কাহিনী এবং সবার উপর তাঁর তেজোময় অপূর্ব্ব কান্তি যেন কিছুতেই ভুলতে পারেন না কর্ম্মদেবী।

চার

আকাশে চাঁদ উঠেছে। দূরে দূরে ছোট ছোট পাহাড়গুলো নির্ব্বাক দৈত্যের মত যেন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! আকাশে দু' এক টুকরা মেঘ আপন মনে ভেসে চলে যাচ্ছে,—যেন তার যাওয়ার শেষ নাই, অন্ত নাই!

একটা ছোট বকুল গাছে ফুল ফুটেছে। কর্ম্মদেবী তাঁর বীণাটা হাতে নিয়ে ভেসে-যাওয়া মেঘের দিকে তাকিয়ে ব'সে আছেন।...পাশে সখী কমলা।...

দু'জনেই চুপ, কারো মুখে কথা নেই।

কিছুক্ষণ পরে কমলা বল্লে,—এমন ফুলের গন্ধ-মাখানো জ্যোৎস্না রাত,—বিয়ের আমোদটা জমবে ভালো।

—আমি ত বিয়ে করবো না, তুই-ই না হয় কর ভাই, আমরা আমোদ করবো—

—সে কি কথা সই? রাজকুমারীর বিয়ে, সারা রাজ্য আনন্দে মেতে উঠেছে, আর তুমি বলছো বিয়ে করবে না?

—সত্যি, দেখিস্—

—কেন, আইবুড়ো থাকবে?

কর্ম্মদেবী চুপ ক'রে রইলেন। ধীরে ধীরে তাঁর চোখ থেকে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

কমলা বল্লে,—একি সখী, তুমি কাঁদছো? কি হয়েছে আমায় বল ভাই?

—তুই মাকে একটা কথা বলতে পারবি কমলা?

—কি?

—তাঁকে বলবি, রাঠোর রাজকুমার অরণ্যকমলের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে—

—সে কি? পছন্দ হয়নি?—

—না।

—তবে?

—তুই জানিস্ ত কমলা, আমার ছোটবেলা থেকেই আকাঙ্ক্ষা —একজন বীরপুরুষের আমি স্ত্রী হব। অরণ্যকমল একজন বড় রাজপুত্র হ'তে পারে, কিন্তু, তার বীরত্বের কোনো কথা কি তুই আজ পর্য্যন্ত শুনেছিস্?

—তবে কে সে ভাগ্যবান্ বীরপুরুষটি ভাই?

'যা পোড়ার মুখী'— —১৬ পৃষ্ঠা

—কেউ নয়।

কমলা সখীর হাত দু'খানা ধ'রে অনুনয় ক'রে বল্লে,—বল সখী, আমার কাছে লুকিয়ো না।

—লুকোবার কিছু নেই ভাই, তা' হ'লে আর বলতুম না।

—আচ্ছা, আমি একটা ঘটকালী করবো? পুগল-রাজ সাধুর সঙ্গে বিয়ে হ'লে তোমায় বেশ মানায়, কেমন?

কর্ম্মদেবীর হাতে এক মুঠো বকুল ফুল ছিল, তিনি সেগুলো কমলার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে মুচকি হেসে বল্লেন, যা পোড়ার মুখী—

কমলা হো হো ক'রে হেসে বল্লে,—ওঃ বুঝেছি, এ ফুল ছোঁড়ার অর্থ এই যে, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক!

কর্ম্মদেবী আর তাঁর মনের কথা চেপে রাখতে পারলেন না। যে কথাটা এতদিন কেবলি তাঁর বুকের ভিতর একটা ঝড় বইয়ে দিচ্ছিল, সে কথাটা যখন কমলা ব'লে ফেলেছে, তখন আর তার কাছে মনের কথা খুলে বলতে সঙ্কোচ কিসের?

কথাটা বলতে যেন তাঁর বড় বাধ-বাধ ঠেক্‌ছিল। অবশেষে তিনি বল্লেন—সত্যি কমলা পুগলরাজ সাধুর সঙ্গে বিয়ে হ'লে খুবই সুখী হই আমি।

কমলা হেসে বল্লে,—দেখ দেখি আমি ঠিক বলেছি কি না?

—তা তো বলেছিস্, এবার ব্যবস্থাটা কর্ দেখি। পার্‌বি কিছু করতে?

—দেখি চেষ্টা করে।

—চেষ্টা নয় সখী। এ আমার মরণ বাঁচন সমস্যা। তুই যদি পারিস্ তো ভাল, আর না পারিস্ তো আমাকেই আমার ব্যবস্থা করতে হবে।

—সে কি সখি, তুমি কি নিজের বিয়ের ঘটকালি নিজেই করবে নাকি ?

—কি করি না করি সে তখন দেখতেই পাবি।

———

পাঁচ

কমলার মুখে মেয়ের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে চমকে উঠলেন রাণী। তিনি রাজাকে বললেন সে কথা।

মেয়ে রাজা রাণীর বড় আদরের ধন। তাঁর সুখের জন্য তাঁরা রাজ্য পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন। এ হেন মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ তাঁরা কিছুতেই করতে পারবেন না। যে বিয়েতে মেয়ে সুখী হবে, যে রকমেই হোক, সেখানেই বিয়ে দিয়ে মেয়েকে সুখী করতে হবে।

তক্ষুণি দু'জন দূত,—একজনকে পুগল-রাজ্যে সাধুর কাছে, আর একজনকে অরণ্যকমলের কাছে পাঠানো হ'লো।

অরণ্যকমলকে নিষেধ করে দেওয়া হ'লো, মাণিকরায় বিশেষ কোনো কারণে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অসমর্থ।

আবার ওদিকে সাধুকে লিখে পাঠালেন,—মাণিকরায় তাঁর হাতে কন্যা কর্ম্মদেবীকে দিতে একান্ত ইচ্ছুক।

এ সংবাদে অরণ্যকমলের বুকখানা যেমন ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল, তেমনি আবার তিনি রাগে জ্ব'লে উঠলেন। অত আশা ভরসা, বিয়ের সমস্ত প্রায় যোগাড় হ'য়ে র'য়েছে, এমন সময় এ কী দুঃসংবাদ!

এদিকে সাধু দূতের মুখে মাণিকরায়ের ইচ্ছার কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, মাণিকরায় তাঁর অমন রূপবতী ও গুণবতী মেয়েকে তাঁর মত ছোট একজন রাজার সঙ্গে সেধে বিয়ে দিতে আসবেন। যা'হোক, সাধু দূতের সঙ্গেই বিয়েতে তাঁর সম্মতি জানিয়ে চিঠি লিখে দিলেন।

———

ছয়

ঔরন্তী নগরে বিয়ের ধুম প'ড়ে গেল। কর্ম্মদেবীর ম্লান মুখে আবার হাসি ফু'টে উঠ্‌লো।

মাণিকরায় আর বেশী দিন দেরী করলেন না, কাছাকাছি যে ভাল দিন ছিল, সেদিনই মেয়ের বিয়ে দেবেন ব'লে ঠিক করলেন।

সাধু বিয়ের দু'দিন আগে লোক-লস্কর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে ঔরন্তী নগরের পাশে তাঁবু ফেল্লেন।

শুভলগ্নে মাণিকরায় সাধুর হাতে তাঁর বড় আদরের মেয়ে কর্ম্মদেবীকে সম্প্রদান করলেন।

কর্ম্মদেবী বীরের সহধর্ম্মিণী হ'লেন,—তাঁর হৃদয়ের আশা পূর্ণ হ'লো।

সাধু কয়েকদিন শ্বশুর বাড়ীতে কাটিয়ে নব-বধূকে নিয়ে নিজ রাজ্যে রওনা হ'লেন।

রাজারাণী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দিলেন।

মা বাপের স্নেহভরা কোল, সখীদের ভালবাসা ছেড়ে যেতে কর্ম্মদেবীর বুকখানাও যেন ভেঙ্গে যেতে লাগলো।

———

সাত

সাধু নববধূকে নিয়ে রাজ্যে ফিরে যাচ্ছেন। সঙ্গে লোকজন সৈন্য-সামন্ত চ'লেছে।

পথে যেতে যেতে পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গলের কত কথা, কত গল্প,—কত যুদ্ধের কথা, কত বীরত্বের গল্প,—কত শিকারের কাহিনী তাঁরা দু'জনে বলতে বলতে যাচ্ছেন।

একটা মরুভূমির মধ্য দিয়ে তাঁদের যাবার রাস্তা।

হঠাৎ 'মার মার কাট কাট' ভীষণ গোলমাল শোনা গেল। সাধু মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখেন, তাঁর সুমুখে হাজার হাজার রাঠোর-সৈন্য পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে! তাদের হাতের বর্শা ও তলোয়ার সূর্য্যকিরণে ঝকমক করছে। তাদের সকলের আগে অরণ্যকমল।

ব্যাপার বুঝতে সাধুর বিলম্ব হ'লো না। অরণ্যকমলের মুখের গ্রাস সাধু কেড়ে নিয়ে যাচ্ছেন, অরণ্যকমল তারই প্রতিশোধ নিতে এসেছে।

সাধু এ বিপদের কথা মোটেই ভাবতে পারেননি; তা' হ'লে তিনি সেই ভাবে তৈরী হ'য়ে আসতেন। তাঁর সঙ্গে মাত্র সাতশ সৈন্য, আর অরণ্যকমল নিয়ে এসেছে চার হাজার!

সাধু কর্ম্মদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন,—এখন কি করা যায়?

কর্ম্মদেবী নির্ভয়ে হাসিমুখে উত্তর করলেন,—বীর তুমি, যুদ্ধ কর। আমি তোমায় সাহায্য করবো।

সাধু বল্লেন,—অনর্থক সৈন্যদের রক্তে মরুভূমির বালি রাঙিয়ে লাভ কি করম?

—তবে কি করবে?

অরণ্যকমল যদি রাজী হ'ন, তা' হ'লে আমি তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করবো।

—বেশ, সে ত উত্তম কথা!

কর্ম্মদেবীর মুখে এই কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যদলকে থামতে আদেশ দিলেন সাধু। বরবেশ দেখতে দেখতে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল যোদ্ধৃবেশে। তিনি তখন তাঁর একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে দূতরূপে পাঠালেন অরণ্যকমলের কাছে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রস্তাব নিয়ে।

রাজপুতদের মধ্যে একটা প্রথা ছিল যে, কেউ যদি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রস্তাব পাঠায়, প্রতিপক্ষকে সে প্রস্তাব মেনে নিতে হবে। প্রতিপক্ষ

যদি তা না মানে তাহলে বীর সমাজে সে হয় ঘৃণিত। অরণ্য-কমলকে তাই বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হ'ল এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের প্রস্তাব।

অচিরেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। যুদ্ধের স্থান নির্দ্ধারিত হ'ল। দুই পক্ষের সৈন্যদল দুই পাশে দাঁড়াল দর্শক হয়ে।

নির্দ্দিষ্ট সময় এগিয়ে এলো। একটু পরেই আরম্ভ হবে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ।

———

আট

সাধু ছল ছল চোখে কর্ম্মদেবীর কাছে বিদায় চাইলেন,…আসি তবে করম, জানি না ভাগ্যে কি আছে।…তুমি—

—আমার জন্য তুমি চিন্তা করো না, বীরকন্যা, বীরনারী, বীরপত্নী আমি, আমার যা' কর্ত্তব্য আমি করবো।

বলতে বলতে তাঁর গলা ভারী হ'য়ে এলো, চোখ জলে ভ'রে গেল।

সাধু জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কাঁদছো করম?

—না, ভাবছি আমার জন্যই তোমার এ বিপদ—

*　　*　　*　　*

সাধু যুদ্ধে চ'লে গেলেন।

একটু দূরে একটা ঘোড়ার উপর ব'সে কর্ম্মদেবী দ্বন্দ্ব যুদ্ধ দেখতে লাগলেন। স্বামীর যুদ্ধের কৌশল ও বীরত্ব দেখে আনন্দে ও গর্ব্বে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌তে লাগলো।

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর—

দু'জনেই দু'জনকে এমন আঘাত করলেন যে, সেই ঘায়ে দু'জনেই অজ্ঞান হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অরণ্যকমলের জ্ঞান হ'লো, তিনি উঠে বসলেন। কিন্তু সাধু সেই মরুভূমির বুকে বালুর উপর যে ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লেন, তাঁর সে ঘুম আর ভাঙ্গলো না।

কর্ম্মদেবী পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হ'য়ে বসে স্বামীর মরণ দেখলেন। তাঁর জীবনের সমস্ত সুখ সাধ মরুভূমির বুকে মিলিয়ে গেল। সমস্ত পৃথিবী আজ তাঁর কাছে একটা প্রকাণ্ড মরুভূমি ব'লে মনে হ'তে লাগলো।

———

নয়

কর্ম্মদেবী আর বেশীকিছু ভাবতে পারলেন না। একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে তলোয়ারখানা খুলে নিলেন।

সৈন্যেরা মনে করলো, স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বুঝি এবার রাণীমা তাদের যুদ্ধে যাবেন।

কিন্তু কর্ম্মদেবী ঘোড়া থেকে নেমে তলোয়ারের এক কোপে তাঁর বাঁ হাতখানা কেটে ফেল্লেন। তারপর সাধুর সেনাপতির হাতে সেই কাটা হাতখানা দিয়ে বল্লেন,—আমার বড় দুর্ভাগ্য যে শ্বশুরঠাকুরের পায়ের ধুলো নিতে আমি পারলুম না,…এই হাতখানা তাঁর চরণে দিয়ে বলো যে, তাঁর পুত্রবধূ এম্‌নি ছিল।

"এই হাতখানা তাঁর চরণে দিয়ে বলো, যে তাঁর পুত্রবধূ এম্‌নি ছিল।"

সেনাপতি স্তব্ধ হ'য়ে হাতখানা ধ'রে নিলেন।

তারপর তিনি একজন সৈন্যকে তাঁর ডান হাতখানা কেটে ফেলতে বল্লেন। সৈন্যের সাধ্য হ'লো না সে আদেশ অবহেলা করতে। কলের পুতুলের মতন সে কর্ম্মদেবীর ডান হাতখানা কেটে ফেল্লে।

কর্ম্মদেবীর মুখে একটু ব্যাথার চিহ্ন নাই। তিনি হাসিমাখা মুখে তাঁর সখীদের ডেকে বল্লেন,—আমার এ হাতখানা আমার বাপের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চারণদের দিও।

শত্রু মিত্র সবাই অবাক্ হ'য়ে বীর নারীর এই অদ্ভুত কাজ দেখলো।

অবিশ্রান্ত রক্ত পড়ায় অল্পক্ষণ পরেই কর্ম্মদেবীর দেহ অবশ হ'য়ে পড়তে লাগলো, তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁর বিয়ের লাল চেলী পরা সুন্দর শরীরখানা সেই মরুভূমির উপর এলিয়ে পড়লো।

তারপর—

তিনি ধীরে ধীরে বল্লেন—চিতা সাজাও। স্বামীর সঙ্গে আমায় এক চিতায় দাহ কর।

ধু ধু ক'রে চিতা জ্ব'লে উঠ্‌লো। যে রূপের জন্য এত কাণ্ড, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই রূপ চিতার আগুনে ছাই হ'য়ে গেল।

—শেষ—